Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 239 - 245
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

তেভাগা আন্দোলনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে সুন্দরবন অঞ্চলের বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়াত সম্পর্কের রূপরেখা : প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস

সুকন্যা পাঁজা
গবেষিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sukanyapanja181095@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025
Selection Date 23. 04. 2025

Keyword
Sundarban, Proletariat, Feudalism, Feudal tyranny, Communism, Tebhaga, Provincial Kishan Sabha.

Abstract
Sundarban is the land of sundari, gewa, goran, keora and tiger, crocodile. But the hunger for land has forced people to set foot there and that was not easy.Humans have conquered the jungle tigers, crocodiles and snakes and have established themselves there. By showing greed for own land, rich feudal lords engaged landless labourers to do this dangerous work. But later refused to give them land.That was the beginning of tussle of proletarian against the landlord of 'Lat'. Then the situation became more complicated regarding the share of crops of the sharecoppers. At the time of 1946 sharecoppers at Chirirbandar of Dinajpur district started a movement demanding 2/3 third of crop. Later it spread throughout the West Bengal and East Bengal. The Bengal provincial Kishan Sabha run by the Communist Party called for the Tebhaga Movement.In September, 1946 the oppressed farmers of Sundarban also joined with this movement. Tebhaga could not be fully successful due to the Government's repressive policies. However the strong impact of Tebhaga forced the Government to enact a land reform law. Above all, Tebhaga tought the proletariat to protest in an organised manner.

Discussion

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার 'তেভাগা সংখ্যা'য় প্রকাশিত 'অহল্যা মায়ের গান' কবিতায় বিনয় রায় বলেছেন -

"সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে ফলালো সে সোনা
তার মা বোনের রক্তে হল সোনার মাটি লোনা,"[১]

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার ওই সংখ্যাতেই প্রকাশিত 'শোন কাকদ্বীপ রে' কবিতায় সাধন গুহ জানিয়েছেন -

"চোখের লোনা জলে সেথায়
সরস হইল মাটি
তারই মাঝে সোনার ফসল।

ফলায় আঁটি আঁটি
আহা সেই ফসল যায় পরের গোলায়
চাষি তো ধান পায় না।।”[২]

‘পশ্চিমবঙ্গ’ পত্রিকায় প্রকাশিত এই দুটি কবিতা থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রলেতারিয়েত - বুর্জোয়া সম্পর্কের সমীকরণটি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। জঙ্গল হাসিলের সময় থেকেই ঘনীভূত হওয়া অত্যাচার ও অসাম্যর আঁচ একসময় তেভাগার দাবানলে পরিণত হয়েছিল। তেভাগা পরবর্তী সময়ে এই পরিস্থিতির কতটা পরিবর্তন হয়েছিল সেই বিষয়টিও এই প্রসঙ্গে আলোচনার দাবি রাখে।

সুন্দরবন বলতে বোঝায় নদী-খাঁড়ি-নোনাজল অধ্যুষিত প্রত্যন্ত দক্ষিণবঙ্গকে। পশ্চিমবঙ্গের দুই চব্বিশ পরগণা ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সুন্দরবনের অবস্থান। গঙ্গার মোহনা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দ্বীপ নিয়েই গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে চব্বিশ পরগণার তৎকালীন কালেক্টর জেনারেল ক্লঁদে রাসেল সুন্দরবনের জঙ্গল ব্যক্তিবিশেষকে শর্তসাপেক্ষে ইজারা দিতে শুরু করেন। এই শর্ত বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হলেও কলকাতার ধন্যাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে লাটআবাদের অঞ্চল মুনাফার লোভনীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে উঠতে থাকে। এই অভিজাত সম্প্রদায় গোমস্তা ও নায়বদের সাহায্যে জল-জঙ্গলের দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করেন। এইসব জঙ্গল হাসিল করতে লোক আনা হত যশোর, খুলনা, মেদিনীপুর, সাঁওতাল পরগণা থেকে। তারা সাপ-কুমির-বাঘের সাথে লড়াই করে জঙ্গলকে কৃষিজমিতে পরিণত করেছিল নিজস্ব একখণ্ড ভূমির প্রলোভনে। কিন্তু ধনী থেকে আরও ধনী হবার আশায় বাবু ও তার গোমস্তারা জঙ্গল হাসিল করতে আসা এই হতদরিদ্র মানুষগুলিকে ঠকাতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই সামন্ত প্রভুদের শোষণকামী মনোভাবের বিপরীতে ক্রমশ প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকে। জমির ফসল বা গাঙের মাছ-সকল ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এইভাবেই সুন্দরবন অঞ্চলে দানা বাঁধে তেভাগা আন্দোলন। লাটাবাদের সূচনা পর্ব থেকে বসতিপত্তনের পরবর্তীকাল পর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা সর্বহারাশ্রেণীর কোণঠাসা হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটে রচিত একাধিক উপন্যাসে।

সুন্দরবনের নিজস্ব প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, জীব-বৈচিত্র্য ও জীবনমৃত্যুর সীমায় দাঁড়িয়ে সেখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহপ্রণালী সম্পর্কে মানুষ বেশ কৌতুহলী। তাই সাহিত্যের প্রেক্ষাপট হিসেবে সুন্দরবন লেখক-পাঠক উভয়ের কাছেই বেশ আকর্ষণীয়। কিন্তু দুর্গমতার কারণে এই অঞ্চলের সাথে সম্যক পরিচিত হওয়া কিছুটা দুষ্কর। সেই জন্যই আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রসঙ্গে সুন্দরবনকেন্দ্রিক রচনা প্রথমে কিছুটা ব্রাত্য ছিল। এরপর সেই প্রতিকূলতা যত কেটেছে ততই রচিত হয়েছে সুন্দরবন কেন্দ্রিক নানান সাহিত্য। ১৯৭৮ সালে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বনবিবির উপাখ্যান’ নামক উপন্যাসের মাধ্যমে সুন্দরবনকেন্দ্রিক সাহিত্যের সূচনা হয়। এরপর একেএকে এসেছেন মনোজ বসু, শিবশংকর মিত্র, আব্দুল জব্বার, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ ঘোষ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিকরা।

সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের বিষয় হিসেবে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এখানকার জনগণের বিপদসংকুল জীবনযাত্রাই প্রাধান্য পেয়েছে। মনোজ বসুর ‘নিশিকুটুম্ব’, ‘শত্রুপক্ষের মেয়ে’ বা শিবশঙ্কর মিত্রের ‘রয়্যাল বেঙ্গলের আত্মকথা’, ‘সুন্দরবনের আর্জান সর্দার’, ‘বনবিবি’ উপন্যাসে সুন্দরবনের দুর্গমতাকে তুচ্ছ করে করে মানুষের জীবনজীবিকার সংগ্রামই বড় হয়ে উঠেছে। আবার বেশ কিছু উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে নতুন উদ্ধার হওয়া ভূমি ও ভূমির ফসলের মালিকানার জন্য ধনীর হাতে দরিদ্রের শোষিত হওয়ার কথা, যা একসময় বঙ্গব্যাপী জ্বলে ওঠা তেভাগার আগুনে ঘৃতাহুতি করেছিল। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বজনভূমি’, ‘চরপূর্ণিমা’, ‘পুবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ’ প্রভৃতি উপন্যাসে ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদী মাটি অরণ্য’ উপন্যাসের তিনটি পর্বে রয়েছে সুন্দরবনের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে তেভাগার কাল পর্যন্ত খেটে খাওয়া মানুষের সাথে ঘটে চলা অত্যাচারের ক্রমান্বয়িক ইতিহাস। এইসব উপন্যাসগুলিতে ফসল ও ভূমির অধিকারকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহীন গাঙ’ উপন্যাসে রয়েছে নদীর মাছের অধিকারের দাবিতে খেটে খাওয়া মানুষের অসন্তোষের কাহিনী।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের প্রথম পর্বে সাম্য-অসাম্যর প্রসঙ্গ তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু 'মাটি বাপের নয় মাটি দাপের।' আর সভ্যতার ইতিহাস এই মাটি দখলেরই ইতিহাস। সুন্দরবনে লাট আবাদের সূচনাপর্ব থেকেই নবলব্ধ জমির দখলকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল শোষণ ও বঞ্চনা। সুন্দরবনকেন্দ্রিক সাহিত্যের প্রথম পর্বে ভূমি ও ফসলের এই অসাম্যের কথা মুখ্য না হলেও কাহিনীসূত্রে এইসব প্রসঙ্গ কখনও কখনও চলে এসেছে। মনোজ বসুর 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের মূল উপজীব্য নরহরি চৌধুরী ও শিবনারায়ণ ঘোষের দ্বন্দ্বমধুর সম্পর্ক। কিন্তু শ্যামগঞ্জের প্রতিষ্ঠা বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্যামগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামসুন্দর চৌধুরীর নির্লজ্জ সম্পত্তিসাধনা সেকালের জমিদারশ্রেণীর আসল রূপটি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করে। এই শ্যামসুন্দর চৌধুরী নিরীহ পথিককে হত্যা করে ধন-সম্পত্তি কুক্ষিগত করেছিলেন এবং সেই ধনসম্পদ রক্ষার মানসে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে গুম পর্যন্ত করেছিলেন। মনোজ বসুর অপর এক উপন্যাস 'বন কেটে বসত'-এ সুন্দরবনে এসে মাছের ভেড়ির কারবারে গগন দাসের মতো অনেকেরই অবস্থা ফিরে গিয়েছিল। এই ভেড়ি তৈরি বা রক্ষণাবেক্ষণ মাছমারাদের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু পশ্চিমাকুলিদের পেয়ে বড় বড় ভেড়ির মালিকরা মাছ মারাদের উপার্জনের পথ বন্ধ করে দিতে ও তাদের বাস্তুচ্যুত করতে দুবার ভাবেনি-

> "মাঝ-মারাদের কথা তো? খাবে না। না খেতে পেয়ে উঠে যাবে তল্লাট ছেড়ে। আপদের শান্তি হবে। তাইতো স্বার্থ আমাদের।"[৩]

সুন্দরবনের গহীন জঙ্গল থেকে কাঠপাতা সংগ্রহ করে দিন গুজরান করে সেখানকার হতদরিদ্র মানুষগুলি। মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে দেখা যায় তাদের এই সামান্য রোজগারেও কিভাবে ভাগ বসায় 'পিটেলবাবু'রা। এই উপন্যাসেই সামান্য টাকার জন্য মেলার ইজারাদার টিকে সর্দার মেলার দেহোপজীবিনী আতরবালাকে চরমভাবে হেনস্থা করেছে। তাদের এই অপমান দরিদ্র গগন দাস বা উমেশের বুকে বাজলেও টাকার নেশায় অন্ধ বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার চ্যালাচামুন্ডাদের কাছে এই মানুষগুলির কোনও গুরুত্বই নেই। এই বুর্জোয়া সমাজের অস্থিমজ্জায় ক্রুরতা। শুধু অর্থের প্রশ্নে নয়, স্বভাবতই যে তারা কত অমানবিক তার প্রমাণ রয়েছে 'নদী মাটি অরণ্য'র প্রথম পর্বে। সেখানে গোমস্তা লাটাবাদের দেশে নবাগত রামকে নৌকায় জায়গাটুকু দিতে চায়নি। সন্ধেবেলায় বাঘের মুখে, সাপের মুখে রেখে চলে যেতে চেয়েছে। শিবশঙ্কর মিত্রের 'বেদে মউলে' উপন্যাসে সামন্তপ্রভুর রূপ আরও ভয়ংকর। সাতজেলের সম্পন্ন চাষী কানাই মন্ডল এক বিধবাকে দু-বস্তা ধান কর্জ দেওয়ার বিনিময়ে বিধবার শিশুসন্তানকে খাটিয়ে নিত। নিতান্ত কচি শিশুটি একদিন কাজের চাপে হাঁপিয়ে পড়লে সময় নষ্ট করার অপরাধে শিশুটিকে মেরে রক্তাক্ত করে দেয় মন্ডল। অর্থপিশাচ নায়েব মহাজনরা চালাকি করে নোনা জল ঢুকিয়ে খাতকের জমিকে অনুর্বর করে তুলতো। নোনাজমিতে ফসল ফলাতে না পারার কারণে খাতকের ঋণশোধ হতো না। আর সেই জমিকে ঋণের পাকে জড়িয়ে গ্রাস করত নায়েবরা। 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার' উপন্যাসের দুর্ধর্ষ আর্জানও এইভাবেই ভিটেমাটি হারিয়েছিল।এই নায়েবি কায়দা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিল। তাই নিজের জীবন বাজি রেখে বাঘ মেরেও সরকার ঘোষিত ন্যায্য পুরস্কার পায়নি আর্জান।

প্রথম দিককার সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে সবলের অত্যাচারের কথা নানা প্রসঙ্গে বর্ণিত হলেও দুর্বলের প্রতিবাদ সেভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। গগন দাস বা উমেশের মতন কিছু মানুষ অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের স্বরে প্রতিবাদের চেয়ে আকুতির সুরই যেন বেশি। কিন্তু ক্রমশ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। যতই দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে ততই তাদের স্বর ফুটেছে। 'নদী মাটি অরণ্য'র প্রথম পর্বে নিজেদের নিরাপত্তাহীনতা ও সে সম্পর্কে বাবুদের উদাসীনতাকে নির্দেশ করে পচন বলেছে –

> "বাবুরা থাইকব্যে টোঙ্গে, মোরা থাকবু পোঙে।"[৪]

কিন্তু এই উদ্যত প্রতিবাদকে প্রতিহত করা হয়েছে লাঠির আঘাতে। এই সময়েই দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান লিগ। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পাশাপাশি এই লিগের আরেকটি লক্ষ্য ছিল দেশীয় জমিদারদের হাত থেকে গরিব প্রজাদের রক্ষা করা। 'নদী মাটি অরণ্য' উপন্যাসের মহিমবাবু ছিলেন এই লিগের সদস্য। এই উপন্যাসের রাম মহিমবাবুর আদর্শের ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে লাটের দেশে সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেছিল। তাই অত্যাচারী মারীচ মাইতিকে মারতে তার হাত কাঁপেনি। সাম্যের মন্ত্র দীক্ষিত রাম অন্য নায়েবদের মতন জমি কুক্ষিগত না করে সমানভাবে বন্টন করে দিয়েছিল মুনিষদের মধ্যে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 26
Website: https://tirj.org.in, Page No. 239 - 245
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার এই মনোভাবে ছিল মার্কসবাদের প্রতিফলন। কিন্তু রামের এই ধরনের জনদরদী কার্যকলাপ বুনো সামন্তের মতো প্রভু সম্প্রদায়কে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। রামের অগ্রগতি রোধ করতে রামের লাটের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে রামরাজত্ব ছারখার করে দিতে চেয়েছিল সে। এই বুর্জোয়া শক্তিই রামের ছেলে কুশধ্বজকে চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছিল, - কিন্তু বাবার আদর্শ থেকে তাকে টলাতে পারেনি। গরানকাঠের লাঠিকে সম্বল করে সে আজীবন সাম্যর জন্য লড়াই করে গেছে।

রামচন্দ্রের লড়াই ছিল নতুন হাসিল হওয়া ভূমির উপর বাস্তুহীনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার। আর কুশধ্বজের লড়াই ছিল ভাগচাষীদের ফসলের ন্যায্য ভাগের জন্য। ফসল কাটার পর যখন ধান ভাগাভাগি হত তখন আগে কর্জ নেওয়া চাল-ডালের দাম দেড়া সুদসহ কেটে নেওয়া হত ভাগ ফসলের পরিমাণ থেকে। তারপর নায়েববাড়ির দেবতার রক্ষণাবেক্ষণের নাম করেও টাকা কাটা হত। এছাড়া নানা অজুহাতে জরিমানা হিসেবেও টাকা কেটে নিত নায়েবরা। ফলে নতুন ফসল থেকে আয় তো দূরের কথা পুনরায় জমিদারের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তো কৃষকরা। আর তাদের এই অসহায়তার সুযোগ নিয়েই মেঘু সামন্তের মতন নায়েবরা তাদের মেয়েদের ইজ্জতটুকুও কেড়ে নিত।

নায়েব গোমস্তারা শুধু টাকার লোভে নিশ্চিত বিপদের মুখে ঠেলে দিতে দরিদ্র মানুষগুলিকে। জঙ্গলকে কৃষিজমিতে পরিণত করে ভূমিলাভই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। সেজন্যই ‘নদী মাটি অরণ্য’ উপন্যাসে কেউটে সাপ দেখে মুনিষরা ভীত হয়ে পড়লে কাজে ক্ষতির আশঙ্কায় ভিখু গোমস্তা বিষধর সাপকে ‘মেট্যা সাপ’ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এই ভিখু গোমস্তা এমনই নিষ্ঠুর যে, কাজের হিসাবে সামান্য কম হলে খোরাকির চাল পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। শোষণ যন্ত্রের পাক অজগরের পাকের মতই মজুরশ্রেণিকে নিঃশেষ করে দিত। হাসিল হওয়া জমির অর্ধেক হত জমিদারের, বাকি অর্ধেক হত নায়েবের। নায়েবের ভাগ থেকে গোমস্তারা কিছু পেত, আর মুনিসদের খোরাকের বরাদ্দ থেকে টাকা রেখে সেই অনুপাতে জমি পেত মুনিসরা। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মুনিষদের ভাগে ঢ্যারাই পড়তো। এইসব নায়েব গোমস্তাদের শুধু যে জমির খিদে ছিল তা নয়। শ্রমিকদের বউ-মেয়েদের প্রতি তাদের লোলুপতা ছিল আগ্রাসী রকমের। তাদের লাম্পট্য থেকে কালু বাউরির সদ্য বিধবা বউ রম্ভাও রেহাই পায়নি। সীতাবালার মতন একজন সাধারণ গৃহবধূকে মারীচ শুধু নিজেই ভোগ করে ক্ষান্ত হয়নি, তাকে করে তুলেছিল সর্বজনভোগ্যা। তাদের এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সীতাবালা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। লাটের দেশের এই অরাজক অবস্থা দেখে জাতীয়তাবাদী নেতা কুশ মিত্রও বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল দেশকে স্বাধীন করার মতোই জরুরি দেশীয় পশুদের হাত থেকে দেশের সাধারণ নিপীড়িত জনগণকে রক্ষা করা। কিন্তু জাতীয়তাবাদী দল দেশীয় জমিদারদের চটাতে চায়নি। কারণ জাতীয়তাবাদী দলের একটা বড় অংশ এই জমিদার ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাদের এই দোটানার কারণেই কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বেড়ে চলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি শুরু থেকেই শ্রমিক ও মজুরদের পক্ষে কথা বলতো। কলকাতার রেলশ্রমিকদের আন্দোলন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে কুশ মিত্র সুন্দরবনে কৃষক সমিতি গঠনে ব্রতী হন। জমিদারপুত্র লবণনারায়ণ নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়েও এই আন্দোলনে সামিল হন। তাঁর স্ত্রী অহল্যা চাষীদের নিজেদের খলেনে ধান তুলতে অনুমতি দেন -

“অহল্যা-মা দিলেন হুকুম
চাষীর চোখে নেইকো ঘুম
ভোর না হতেই ধান কাটতে
ছুটলো মাঠের পানে
মাঠের পর মাঠ ভাসছে
সোনা রঙের ধানে।।”[৫]

কলকাতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টিও বিভিন্ন নেতাকে এই অঞ্চলে পাঠাতে থাকে সংগঠন গড়ে তোলার জন্য। তারা বুঝতে পারে যে, অত্যাচারী নায়েব-গোমস্তাকে হত্যা করে সামন্তপ্রভুদের মনোবল ভাঙতে হবে। একাধিক সভা করে তারা কৃষকদের নিজেদের ন্যায্য দাবি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে। ধর্ষিতাকে দিয়ে মামলা করানো হয় ধর্ষক মেঘু সামন্তের বিরুদ্ধে। মেঘু সামন্তর দখলীকৃত জমির ধান জড়ো হয় ভাগচাষীদের খামারে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সম্পাদক বঙ্কিম মুখার্জী চাষীদের আন্দোলন জোরদার করতে ‘লাল পতাকা কমিটি’ তৈরি করেন। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে

অতিরিক্ত জমি গরিব কৃষক-মজুদদের মধ্যে বন্টন করার দাবি তোলা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতিও বিধানসভায় তাদের দাবি পেশ করে। ফলে কৃষকদের দুর্দশা অনুসন্ধান করতে ভূমিসংস্কার কমিশন গঠিত হয়। ইংরেজ সরকারও কৃষকের দুঃখমোচনে উদ্যোগী হন। হেমিল্টন সাহেব মহাজনদের অত্যাচারের হাত থেকে জলজঙ্গলের দেশের মানুষগুলিকে বাঁচাতে সমবায় প্রথার প্রচলন করেন। তিনি গোসাবায় সমবায় ব্যাংক, সমবায় বিপণি, মাছের কো-অপারেটিভ স্থাপন করে হতদরিদ্র মানুষগুলিকে মহাজনের ঋণের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। এরপর আসে তেভাগার কাল। ভাগচাষ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানকল্পে তৈরি হয়েছিল ‘সুন্দরবন ভাগচাষী হিতৈষী কমিটি’। তাদের দাবি ছিল - জমিদারের প্রাপ্য উৎপাদিত ফসলের অর্ধের নয়, তিন ভাগের এক ভাগ। তাদের এই দাবিই বীজ বপন করে তেভাগার। এই আন্দোলন এতটাই তীব্র ছিল যে, পুলিশ চাষীর পরিবর্তে গোমস্তাদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। কৃষকরা ‘কমরেড’ আর ‘ইনকিলাব’ স্লোগান দিয়ে দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে রয়েছে সুন্দরবনের নারীরা। যে প্রতিবাদের মশাল সীতাবালা, অহল্যা জ্বালিয়েছিল তা হস্তান্তরিত হয়েছিল অহল্যা, বাতাসীদের কাছে। গ্রামের সুরোপিসি বুদ্ধির খেলায় পুলিশকে হারিয়ে নিশ্চিত গ্রেপ্তারির হাত থেকে বাঁচান নেতা হেমন্ত ঘোষালকে। দারোগাকে নিয়ে রাইচরণ গ্রামে এলে বাতাসী আর অহল্যা রাইচরণকে ঝাঁটাপেটা করেছিল। গর্ভবতী অহল্যা আর বাতাসী - দুজনকেই হত্যা করে পুলিশ। তাতেও সরোজিনী, উত্তমীরা পুলিশের সাথে সম্মুখসমরে পিছপা হয়নি।

এই সময় কিছুদিনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হলে কমিউনিস্ট নেতারা আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। নায়েব গোমস্তারাও ধর্মীয় বিভেদতত্ত্ব দিয়ে চাষীদের মিলিত আক্রমণকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। এরপর বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী প্রভৃতির কারণে এ আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই রকম অরাজক অবস্থায় ধান ভাগাভাগি নিয়ে জোতদার-বর্গাদার সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়। আদালতের রায়ে বহু চাষী জমিচ্যুত হয়। কিন্তু যেখানে চাষীদের মনের পরিবর্তন ঘটে গেছে সেখানে কোন ভয়ই আর ভয় নয়। আগে দেখা গিয়েছে প্রতিবাদীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার ঘটনা। কিন্তু ‘নদী মাটি অরণ্য’র তৃতীয় পর্বে কার্তিক জানা ও পটলকে মারধর ও আটকের ঘটনা সমবেত চাষীকে ভীত তো করেইনি উল্টে তাদের আন্দোলনকে আরও ভয়ংকর করেছে। কৃষক সমিতির মিছিলে পুঁইফলের রঙে লাল ঝাণ্ডা বানিয়ে ‘তেভাগা চাই, তেভাগা ছাড়া ধান নাই’ স্লোগান দিতে দিতে অগণিত কৃষক সমবেত হয়। যতীন মাইতি, কংসারি হালদার, হেমন্ত ঘোষাল, রাসবিহারী ঘোষের মত কমিউনিস্ট নেতার কর্মসূচির মধ্যে নিজেদের অধিকার পূরণের স্বপ্ন দেখে তারা। কোনও জমিদার তাদের দাবি না মানলে কৃষকরা জমিদারকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয় ও কাছারির মরাইতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর ১৯৫০ সালের মধ্যে সরকারি দমননীতি ও দলীয় বিভাজনের কারণে তেভাগার প্রবলতা হ্রাস পায়। তাৎক্ষণিক লক্ষ্যে তেভাগা আন্দোলন হয়তো সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভূমি সংস্কারের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত হয়। এই সংস্কারের মধ্যে ছিল জমিদারি প্রথার বিলোপ ও ও জমির পুনর্বন্টন। নিম্নবিত্ত কৃষকদের মধ্যে সংগঠিত ভাবে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার সাহস যুগিয়ে ছিল তেভাগা। পরবর্তীকালে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ বা নকশাল আন্দোলনের উপরেও তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। একেবারেই সাধারণ পরিবারের গৃহবধূরা যেভাবে তেভাগায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা সর্বস্তরের ভারতীয় নারীদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথকে সুগম করে দিয়েছিল।

তেভাগা আন্দোলনের বিপুল সাফল্য ও সেই সূত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সুপ্রতিষ্ঠা লাট আবাদের দেশে শোষক ও শোষিতের মধ্যে কতটা সাম্য ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল এ আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাসে। ‘নদী মাটি অরণ্য’ উপন্যাসে দেখা গিয়েছিল যে, তৎকালীন ভারতে বড়লোকেরা কেবলমাত্র কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সবাই সমান। তাই গরীব বনবিহারীকে ভোটে জিতে পঞ্চায়েত সদস্য হতে দেখা গেছে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। কিন্তু তার এই জয় এলাকার পুরনো সামন্তপ্রভুরা ভালো চোখে নেননি। অন্যদিকে বনবিহারীকেও পেয়ে বসেছে ‘বুর্জোয়া ভূত।’ ‘হঠাৎ বড়লোক’ বনবিহারী ‘হঠাৎ কলোনি’র পত্তন করে ভূমিহারা দরিদ্রদের থেকে পয়সা লুটতে শুরু করে দেয়। এই সময় রাজনৈতিক চালে ধর্মকে হাতিয়ার করে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার বহু মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল। ‘চরপূর্ণিমা’র মিন্টু দাস বা ‘সমুদ্রদুয়ার’-এর হাসেমদের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে ধানমুড়ির খোঁজে চলে এসেছিল

পশ্চিমবাংলায়। কিন্তু সর্বহারাদের মাটি কোনোও দেশেই নেই। জীবিকার সম্বল চরটুকু পেতে নানা মহলে হাজার হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছিল মিন্টু দাসকে। আবার এই মিন্টু দাসই মাছের কারবারে যখন পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছে তখন তার রূপ গেছে বদলে। মাছের কারবারে লাখ লাখ টাকা কামালেও দরিদ্র মজুদদের এক টাকাও মাইনে বাড়াতে সে রাজি নয়।

তেভাগা আন্দোলনের সংগঠক কৃষক নেতারা পরবর্তী সময়ে অনেকেই জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে স্থান পেয়েছিলেন। কৃষক নেতা কংসারি হালদার কমিউনিস্ট পার্টির তরফে লোকসভায় প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু লাটের দেশের তেভাগার নেতারা যোগ্য সম্মান পাননি। স্বজনভূমির বিলাসের ক্ষোভ যে, 'লাল পতাকাওয়ালা কমিউনিস্ট ছোকরা লুটেরা'দের জন্যই তারা লাটদার থেকে ভিখারি হয়ে গেছে। সতীশ মাইতি তার জমি ৮০-৮৫ বিঘা থেকে ২৫-২৬ বিঘা হয়ে যাওয়ার জন্য অতুল কামিল্যাকেই দায়ী মনে করেন। আবার দেবেনের মতন ছেলের কাছে তেভাগা সংগ্রামী বাবা গজেন বুড়ো গর্বের কারণ। কিন্তু অতুল কামিল্যার ছেলে শম্ভু 'তেভাগা' নিয়ে বাবার অনুভূতি-আবেগকে উপলব্ধিই করতে পারেনি। তাই তার মনে হয়েছে যে, বাবা তেভাগায় যোগ না দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলে পেনশন বেশি পাওয়া যেত।

'পুবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ' ও 'স্বজনভূমি' উপন্যাসে দেখা গেছে যে, পূর্বের লাটদারেরাই সিনেমা হলের মালিক, বাড়ির মালিক, জেনারেটর ব্যবসায়ী, খটিদারে পরিণত হয়ে জোতদারের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। 'পুবের মেঘ পশ্চিমের আকাশ' উপন্যাসের রায়বাবু সময় পরিবর্তিত হলেও নিজের সামন্ততান্ত্রিক খোলস ছাড়তে পারেননি। তিনি তাঁর ভাড়াটেদের মধ্যে ভাগচাষীরই রূপ খুঁজে বেড়ান। বুর্জোয়াপন্থী মধ্যস্বত্বভোগীদের কালোবাজারি কারণেই বাংলায় এই সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়ে দিয়েছিল। ফড়েরা দেশের চাল মজুত করে বেশি দামে যুদ্ধের সৈনিকদের বিক্রি করত। নেটিভের পেটের দানা ফুটতো সৈনিকের ব্যারাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে ভদু মাইতির মতো লোকেরা চিত্রনাথের মতো অসহায় লোকের থেকে নামমাত্র মূল্যে জমি জমা কিনে তাদের ভূমিহীন, আশ্রয়হীন পথের ভিখারি করে দেয়। ধনীদের বিপুল সম্পত্তি ভাগচাষীদের মধ্যে বন্টন করা হয় তেভাগার কালে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পেটের দায়ে বহু ভাগচাষীই নিজের ভাগের জমি বন্ধক দিয়েছে মহাজনের কাছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে লাট আবাদের দেশের ডাক্তারবাবুর সমবায় স্থাপনের স্বপ্ন খটিদার আব্দুল অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিয়েছে। শ্রীপদকে কো-অপারেটিভে মাছ বিক্রি করা থেকে নিরস্ত করতে না পেরে আব্দুল শেষপর্যন্ত শ্রীপদর মাছ অপহরণ করে নিয়েছে। ফলতঃ এইসব ক্ষেত্রে তেভাগার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এইরকম পরিস্থিতিতেই দানা বাঁধে খাদ্য আন্দোলন ১৭.৫০ টাকা মণ চালের দাম ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের অপসারণের দাবিতে সোচ্চার হয় কমিউনিস্ট পার্টি।

তেভাগা আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল বহু আশার - বহু প্রতিশ্রুতির। সব প্রতিশ্রুতি হয়তো বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তবুও তেভাগা যে সাম্যবাদের বাতাবরণ তৈরি করতে পেরেছিল তা সামাজিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'স্বজনভূমি' উপন্যাসে দেখা গেছে তেভাগার চাপে পড়ে ২০০-২৫০ বিঘের মালিক আজ কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালায়। আর তাদেরই বাড়িতে মুনিশখাটা বংশের ছেলে লেখাপড়া শিখে মাস্টার হয়ে সচ্ছল জীবন যাপন করছে। এই উপন্যাসেই অহল্যার ছেলে রতিকান্তকে অটলবাবুর মত মানুষরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান ও স্কুল শিক্ষক অটলবাবু রতিকান্ত ছাড়া শহীদ দিবস পালন করতে চেয়েও ব্যর্থ হন। তেভাগাই মানুষকে শিখিয়েছে কালুবাবু - ভদুবাবুর মতো জোতদারদের চালাকির বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একত্র হতে। সমাজের অবহেলিত মানুষদের সংঘবদ্ধ করে তুলতে ভ্যানচালক সমিতি, মুটে মজদুর ইউনিয়নের মতো একাধিক সংগঠন তৈরি হয়। আর এইখানেই তেভাগা আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

Reference:

১. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা : তেভাগা সংখ্যা, ৪২-৪৬ সংখ্যা, বর্ষ-৩০, ১৯৯৭, পৃ. ৩০
২. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা : তেভাগা সংখ্যা, ৪২-৪৬ সংখ্যা, বর্ষ-৩০, ১৯৯৭, পৃ. ৭০
৩. বসু, মনোজ, বন কেটে বসত, কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮, পৃ. ৪২০
৪. বন্দোপাধ্যায়, তপন, নদী মাটি অরণ্য (প্রথম পর্ব), কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ৪১

৫. বন্দোপাধ্যায়, তপন, নদী মাটি অরণ্য (প্রথম পর্ব), কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৮, পৃ. ৪৩

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, চরপূর্ণিমা, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৫
চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, পুবের মেঘ দক্ষিণের আকাশ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮
চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, সমুদ্র দুয়ার, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০১০
চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, স্বজনভূমি, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪
চট্টোপাধ্যায়, সাধন, উপন্যাস সমগ্র (১ম খন্ড), কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৪১৮
বন্দোপাধ্যায়, তপন, নদী মাটি অরণ্য, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী ১৯৯৮
বসু, মনোজ, জলজঙ্গল, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৮
বসু, মনোজ, নিশিকুটুম্ব, কলকাতা : গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬০
বসু, মনোজ, বন কেটে বসত, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬৮
বসু, মনোজ, শত্রুপক্ষের মেয়ে, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৩
মিত্র, শিবশংকর, সুন্দরবন সমগ্র, কলকাতা : সমকাল প্রকাশনী, ১৩৭১

সহায়ক গ্রন্থ :

চক্রবর্তী, সুমিতা, উপন্যাস বহুরূপে, কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী, ১৪১৭
চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর, বন্দর, কলকাতা : প্রজ্ঞা, ১৯৫৯
চট্টোপাধ্যায়, সাধন, শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০০৭
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯-২০
বসু, মনোজ, বনমর্মর ও অন্যান্য গল্প, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৩৯
মুখোপাধ্যায়, জগমোহন, গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮
রায়, অলোক, সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য, কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০১০
শ', রামেশ্বর, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৮
সেন, মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৩৫৯
সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খন্ড), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫

সহায়ক পত্রিকা :

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা : তেভাগা সংখ্যা, ৪২- ৪৬ সংখ্যা, বর্ষ-৩০, ১৯৯৭